গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ২৫ সংখ্যা | ১২ - ১৮ মার্চ ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

রেল বিক্রির জমি তৈরি করতেই ভাড়া বৃদ্ধি এসইউসিআই(সি)

কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি রেলের প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম ১০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ টাকা করেছে এবং স্বল্পদূরত্বের প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ন্যূনতম ভাড়াও ৩০ টাকা ধার্য করেছে। এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৬ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন,

আমাদের দেশে গরিব এবং নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের প্রধান পরিবহণ মাধ্যম হল রেল। বেসরকারি কর্পোরেট পুঁজিমালিকদের কাছে রেল পরিষেবা বিক্রির দরজা খুলে দিয়ে মোদি সরকার ইতিমধ্যেই রেলের ভাড়া বৃদ্ধির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছে। জনস্বার্থ বলি দিয়ে পুঁজিপতিদের তুষ্ট করতেই প্ল্যাটফর্ম এবং স্বল্পদূরত্বের প্যাসেঞ্জার ভাড়ার এই বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। আমরা এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করছি।

উন্নয়নের ফাঁপা বুলিতে ভুলবেন না

নির্বাচন ঘোষণা হতে না হতেই শাসক দলগুলির নেতারা সব নানা পসরা নিয়ে ময়দানে হাজির। কেউ পরিবর্তনের কথা বলছেন তো কেউ উন্নয়নের। নানা নাম তাঁদের। পতাকার রঙ আলাদা, দলের নাম আলাদা। কিন্তু সবার মুখে শুধুই উন্নয়নের কথা। নির্বাচন এই প্রথম নয়। এর আগে অনেক নির্বাচন হয়েছে। তাতে এই দলগুলিই তো জিতেছে। এরাই তো সব কখনও না কখনও কোথাও না কোথাও সরকারে থেকেছে, এখনও আছে। এরা যদি 'উন্নয়নের' এত বড় কাণ্ডারি, তবে জনজীবনের হাল এতদিনেও পাল্টায়নি কেন? কেন তবে তাদের জীবনে দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে? তা হলে যে উন্নয়নের কথা এই সব শাসক দলের নেতারা সর্বক্ষণ আউড়ে চলেছেন তা কার উন্নয়ন? আর পরিবর্তন বলতে কি এই সব নেতারা মানুষের জীবনের দুরবস্থার পরিবর্তন বোঝাচ্ছেন? তবে সে পরিবর্তন স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরেও হল না কেন? আসলে এঁরা যে পরিবর্তনের কথা বলছেন তা কেবল সরকারের পরিবর্তন। তার সাথে জনগণের দুরবস্থার পরিবর্তনের সম্পর্ক আছে কি?

উন্নয়ন কাকে বলে

উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? উন্নয়ন মানে দেশের মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা এবং সকলের জন্য উন্নত জীবনধারণের উপযুক্ত রোজগারের সুব্যবস্থা। দেশের উন্নয়ন মানে তো দেশের মানুষের উন্নয়ন! অর্থনীতির বিকাশ মানে তো দেশের মানুষের আর্থিক ক্ষমতার বিকাশ! এই সব দলগুলির রাজত্বে কি তাই হচ্ছে? উন্নয়ন হচ্ছে মানে তো দেশের কর্মক্ষম সব মানুষের কাজের ব্যবস্থা হওয়া। উন্নয়নের মানে তো জিনিসপত্রের দাম এমন হওয়া যাতে সব মানুষ তা কিনতে পারে। উন্নয়ন মানে তো যখন তখন ছাঁটাই বন্ধ হওয়া, ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত হওয়া। উন্নয়ন মানে নারীর মর্যাদা এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হওয়া, প্রতিটি শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের ব্যবস্থা হওয়া, বিনা খরচে প্রতিটি ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া। উন্নয়ন মানে তো রোগের চিকিৎসা প্রত্যেকের আয়ত্তের মধ্যে আসা। উন্নয়ন মানে কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়া। উন্নয়ন মানে প্রতিটি নাগরিকের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার থাকা, দুর্নীতি পুরোপুরি বন্ধ করা। অর্থাৎ দেশের প্রতিটি মানুষের আর্থিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশে কোনও বাধা না থাকা। বিজেপি

দুয়ের পাতায় দেখুন

পশ্চিম মেদিনীপুরে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিতে চলেছেন। জেলায় ১৫টি আসনের মধ্যে ১৪টিতে প্রার্থী দিয়েছে দল।

ধর্ষিতাকে বিয়ে করলে রেহাই ধর্ষকের!

প্রধান বিচারপতির মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ধর্ষণ সংক্রান্ত একটি মামলায় অভিযুক্তকে প্রশ্ন করছেন সে ধর্ষিতা মেয়েটিকে বিয়ে করতে রাজি আছে কি না? তা হলে তাকে জেল খাটতে হবে না এবং সরকারি চাকরিও বজায় থাকবে।

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বিহারের পাটনায় মহিলাদের মিছিল

এই মন্তব্যে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এআইএমএসএসের সাধারণ সম্পাদক কমরেড ছবি মহান্তি ৩ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, একজন নাবালিকা স্কুল ছাত্রীকে প্রতারণা, বেঁধে রাখা, গলা টিপে ধরা এবং বারবার ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হননি অভিযুক্ত সুভাষ চৌহান, মেয়েটির মুখ বন্ধ করতে পেট্রল ঢেলে তাঁকে পুড়িয়ে দেওয়া, তাঁর মা ও ভাইয়ের গায়ে অ্যাসিড ঢেলে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছিল।

এই নির্যাতিতা আত্মহত্যার চেষ্টা করলে মামলাটি জনসমক্ষে আসে। বোম্বে হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের দেওয়া আগাম জামিনকে বাতিল করেছে সঙ্গতভাবেই। এমন একটি মামলায় প্রধান বিচারপতির মন্তব্য থেকে মনে হয় যেন তিনি অপরাধীদের শাস্তিদানের জন্য দায়বদ্ধ বিচারক নন। বরং তিনি যেন জঘন্য অপরাধীকেও বুঝিয়ে-শুনিয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দে জীবন কাটাতে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন। সম্ভবত তিনি চরম অপরাধের শিকার নির্যাতিতাকে একটি বস্তু হিসাবেই দেখেছেন।

ধর্ষিতাকে বিয়ে করেই ধর্ষণের দোষ স্খালনের এই প্রস্তাব ভারতীয় সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাকেই প্রকট করে তুলেছে। যে মানসিকতা সুপ্রিম কোর্টের সর্বোচ্চ পদাধিকারীর কথাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ আসনকেও যখন এই কলুষ স্পর্শ করতে পারছে সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের মেয়েরা বিচারব্যবস্থার উপর কেমন করে আস্থা রাখবে? বিচার এবং অপরাধীর শাস্তিকে ত্বরান্বিত করবে সে আশা করাটাই তো স্বাভাবিক ছিল! দেশের বিচারব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সকলের সাথে সর্বস্তরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ বিশেষত নারী সমাজের কাছে আবেদন, ন্যায় বিচারের দাবিতে সোচ্চার হোন।

ফাঁপা বুলিতে ভুলবেন না

একের পাতার পর

তৃণমূল কংগ্রেস সিপিএম প্রভৃতি দলগুলির নেতারা যে উন্নয়নের বুলি বরাবরের মতো আবারও মানুষের সামনে আওড়াচ্ছেন, তা কি এই উন্নয়ন? তা হলে তাদের সরকারের শাসনে এই উন্নয়ন তো হওয়ার কথা। দেশের কোথাও তা হয়েছে কি?

বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএমের মুখে উন্নয়ন আর পরিবর্তনের বুলি

সবার মনে আছে, এ রাজ্যে মানুষ যখন সিপিএমের দীর্ঘ অপশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম সহ রাজ্যজুড়ে কৃষক আন্দোলন-গণআন্দোলন আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ছে তখন পরিবর্তনের স্লোগান তুলে ক্ষমতায় বসেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও সিপিএম শাসনের প্রথম দু'দশক তৃণমূলের অস্তিত্বই ছিল না। সিপিএম পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকার চালাতে গিয়ে একের পর এক যে সব জনবিরোধী নীতি নিয়েছে তার বিরুদ্ধে লাগাতার গণআন্দোলন গড়ে তুলেছে একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। বিদ্যুতের দামবৃদ্ধি, জিনিসপত্রের দামবৃদ্ধি, বাসের ভাড়াবৃদ্ধি, প্রাথমিক স্তর থেকে পাশ-ফেল তুলে দেওয়া, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণ প্রভৃতি প্রতিটি বিষয় নিয়েই প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করেছে এই দল। মূল্যবৃদ্ধি-ভাড়াবৃদ্ধি আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে ১৯৮৩ এবং ১৯৯০ সালে শহিদের মৃত্যুবরণ করেছেন কমরেড হাবুল রজক, শোভারাম মোদক এবং কমরেড মাধাই হালদার। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও শতাধিক কর্মী। শুধু দক্ষিণ ২৪ পরগণায় সিপিএম মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন দেড়শোর বেশি এসইউসিআই(সি) দলের নেতা-কর্মী। মিথ্যা মামলায় জেল খেটেছেন কয়েক শত। ইংরেজি তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে '৯৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি অভূতপূর্ব বাংলা বনধ হয়েছে। যার ফল হিসাবে ইংরেজি ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছিল সিপিএম সরকার। পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকার চালাতে চালাতে একসময়ে তারা টাটা-সালিমের মতো কর্পোরেট পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষায় হাজার হাজার একর উর্বর কৃষিজমি তাদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন গড়ে তোলে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। দু'জায়গাতেই গড়ে ওঠে গণকমিটি। কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলন চলতে থাকে। পরে সেই আন্দোলনে যোগ দেয় তৃণমূল কংগ্রেস। সিপিএমের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রবল গণবিক্ষোভ যাতে সঠিক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ না হয় তার জন্য বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যম শুধুমাত্র তৃণমূলকেই প্রচার দিতে থাকে। তৃণমূল নেত্রীকে 'অগ্নিকন্যা' উপাধিতে ভূষিত করে। অথচ তৃণমূল নেত্রী যদি সিঙ্গুর থেকে আন্দোলনকে ধর্মতলার অনশন মঞ্চে তুলে না নিয়ে যেতেন তবে সিঙ্গুরে সিপিএম সরকার কৃষকদের জমি দখল করতে পারত না। নন্দীগ্রামে তৃণমূল নেত্রীর কোনও ভূমিকাই ছিল না। স্থানীয় তৃণমূল নেতা-কর্মীরা ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্ব মেনে আন্দোলন চালানোয় সরকার শেষ পর্যন্ত পিছু হঠতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলন ভাঙতে সিপিএম শুধু পুলিশ ও দলের গুন্ডাবাহিনী দিয়ে গণহত্যাই চালায়নি, গণধর্ষণ চালিয়েছিল। একটা সরকারের নেতৃত্বে সংগঠিতভাবে গণধর্ষণ এর আগে হয়নি। সেই পরিস্থিতিতে জনগণের দাবি মেনে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) ডাক দেয় 'সিপিএম সরকারকে পরাস্ত করুন'। এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সিপিএমকে মার্কসবাদী হিসাবে দেখিয়ে তৃণমূল ও বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যম মার্কসবাদ ও কমিউনিজম বিরোধী যে প্রচার চালাতে পারত তাতে লাগাম পরানো। তৃণমূল সরকার গঠন করার পর আমন্ত্রণ জানালেও এস ইউ সি আই-সি তাতে যোগ দেয়নি। এস ইউ সি আই-সি জানিয়ে দেয়, এই সরকার সোনার বাংলা গড়বে না। সদিচ্ছা থাকলে দুর্নীতি কিছুটা দূর করতে পারে, গণআন্দোলনকে পুলিশি সন্ত্রাস থেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা আশাবাদী নই। বাস্তবেও জনজীবনে পরিবর্তন আনার পরিবর্তে এই সরকার প্রথমে কংগ্রেস এবং পরে ৩৪ বছর ধরে সিপিএম সরকারের শাসন যে কালা ইতিহাস রেখে গেছে সেই পথেই চলছে। চুরি-দুর্নীতি-তোলাবাজি-স্বজনপোষণ, জনগণের পরিবর্তে পুঁজিপতিদের স্বার্থ দেখা, পুলিশ-প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার, সন্ত্রাস তৈরি করে অন্যদের ভোটে দাঁড়াতে না দেওয়া প্রভৃতি সবই একই রকম চলছে। ফলে এই সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যের মানুষের ক্ষোভও ক্রমাগত বাড়ছে।

এস ইউ সি আই (সি) এই সরকারের জনবিরোধী নানা পদক্ষেপ এবং চুরি-দুর্নীতির বিরুদ্ধে একের পর এক আন্দোলন গড়ে তুলেছে। ২০১৫ সালে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে পুলিশি অত্যাচারে দলের দুই কর্মীর চোখ নষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়াও দলের নেতৃত্বে আশা, অঙ্গনওয়াড়ি, মিড ডে মিল, পুরস্বাস্থ্যকর্মী সহ নানা স্কিম ওয়ার্কাররা আন্দোলন করে বহু দাবি আদায় করেছে। বিদ্যুতের মাশুল কমানো ও ছোট কৃষককে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন চলছে। ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠন নানা দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

বিজেপির পরিবর্তনের ডাক নিছকই সরকার পরিবর্তনের জন্য

রাজ্যের জনগণের ক্ষোভকে কাজে লাগাতে এ বার মাঠে নেমে পড়েছে বিজেপি। তাদের চটকদার স্লোগান— 'আসল পরিবর্তন'। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের এই পরিবর্তন মানে শুধুই সরকারের পরিবর্তন। বিজেপি এখন এ দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণির সবচেয়ে বিশ্বস্ত দল। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় বসার পর থেকে পুঁজিপতিদের স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে একের পর এক নীতি ও পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে বিজেপি। বিজেপির পুঁজিবাদী নীতির কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আজ আকাশ ছুঁয়েছে। তেল-গ্যাস-কেরোসিন থেকে ভরতুকি তুলে নেওয়ায় এসবের দাম বেড়েই চলেছে। সাধারণ মানুষের জীবন ক্রমাগত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। আম্বানি-আদানি সহ একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা এগুলি থেকে যথেচ্ছ মুনাফা করে চলেছে এবং বিজেপি সরকার তারই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। করোনা মহামারির সময়ে যখন লক্ষ শ্রমিক হাজার হাজার কিলোমিটার পথ হাঁটছে, কাজ হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে ঘরে ফিরছে তখন দেশের একচেটিয়া পুঁজির মালিকেরা ৩৫ শতাংশ মুনাফা বাড়িয়েছে। এই সরকার লকডাউনে কাজ হারানো মানুষের জন্য যখন বরাদ্দ রেশনটুকু বন্ধ করে দিল, ঠিক তখনই প্রধানমন্ত্রী ২০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে আর একটি সংসদ ভবনের শিলান্যাস করলেন। বিজেপির পরিবর্তনে এগুলি পরিবর্তনের কোনও উল্লেখ নেই।

বিজেপি সরকার যে নতুন কৃষি নীতি নিয়ে এসেছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য গোটা কৃষিব্যবস্থাটিকে আম্বানি-আদানিদের মতো কৃষিপণ্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া। কৃষকদের সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেওয়া। ধীরে ধীরে জমি কেড়ে নিয়ে তাদের কোম্পানির মজুরে পরিণত করে দেওয়া। রাজধানী দিল্লির প্রান্তে সারা দেশের কৃষকরা এই নীতির প্রতিবাদে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। দিল্লির প্রবল ঠাণ্ডা এবং অন্যান্য কারণে ইতিমধ্যেই প্রায় ২৬০ জন কৃষক শহিদ হয়েছেন। চরম অগণতান্ত্রিক বিজেপি সরকার মামুলি কিছু বৈঠক ছাড়া কৃষকদের দাবির প্রতি কোনও মর্যাদাই দেখায়নি।

নতুন শিক্ষানীতিতে পুরোপুরি বেসরকারিকরণ করে শিক্ষাকে ব্যবসার পণ্যে পরিণত করেছে এই সরকার। এই নীতি কার্যকর হলে সাধারণ পরিবারের সন্তানরা শিক্ষার সুযোগ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হবে। এই নীতির বিরুদ্ধে শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবীরা তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং এই আইন প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন।

বিজেপি সরকার চরম অগণতান্ত্রিক ভাবে মানুষের স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকারকেই কেড়ে নিচ্ছে। সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনাকে রাষ্ট্রদ্রোহ হিসাবে দেগে দিয়ে প্রতিবাদীদের জেলে পুরছে। ভারতের দীর্ঘ দিনের গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে ধ্বংস করে সংখ্যালঘু বিদ্বেষকে প্রকাশ্যে মদত দিচ্ছে।

বিজেপি এ দেশে নবজাগরণের চিন্তাকে অস্বীকার করে মানুষকে প্রাচীন যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা, যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসারের পরিবর্তে ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে বাড়িয়ে তুলতে চায়। মানুষের মধ্যে ধর্মান্ধতা জাগিয়ে তুলতে পারলে পুঁজিবাদের বিশ্বস্ত ম্যানেজার হিসেবে পুঁজিবাদের সঙ্কটকে জনগণের চোখ থেকে আড়াল করতে পারবে তারা। কেন দারিদ্র? কেন অনাহার-অর্ধাহার? চাকরি নেই কেন? শিক্ষা-চিকিৎসার সুযোগ নেই কেন? অদৃষ্ট, কপাল। ঈশ্বরকে ডাকো, পরের জন্মে সব পাবে। মানুষকে এ কথা বোঝাতে পারলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যা থেকেই মানুষের জীবনের সব সঙ্কটের জন্ম, তাকে শোষিত মানুষের বিক্ষোভ-বিদ্রোহের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। সেই কাজটিই এ দেশে বিজেপি করে চলেছে। জার্মানিতে একদিন হিটলার ঠিক এই কাজটিই করেছিল।

বিজেপি গোটা স্বদেশি আন্দোলনেরই বিরোধী। দেশের মানুষ যখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জীবন পণ করে লড়াই করেছে, আন্দোলন করে জেলে গেছে, অত্যাচার সহ্য করেছে, ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছে, তখন বিজেপির পূর্বসূরিরা ব্রিটিশের পরিবর্তে মুসলমানদেরই দেশের প্রধান শত্রু হিসাবে প্রতিপন্ন করেছে এবং ব্রিটিশকে সব দিক থেকে সহযোগিতা করেছে। তারা এমনও বলেছে, যারা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা আসলে প্রতিক্রিয়াশীল।

বিজেপি মুখে হিন্দুত্বের কথা বললেও বাস্তবে ধর্মীয় নেতাদেরও মানে না। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কোনও ধর্মীয় বিদ্বেষ ছিল না। রামকৃষ্ণ মসজিদে গিয়ে নমাজ পড়েছেন, চার্চে গিয়েছেন। বিবেকানন্দ বলেছেন, একই সঙ্গে আমি মুসলমান, আমার স্ত্রী খ্রিস্টান, ছেলে বৌদ্ধ হতে পারে। বিবেকানন্দ গোহত্যা নিবারণী সমিতির সদস্যদের আগে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকে বাঁচানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। অথচ বিজেপি গোরক্ষার নামে মুসলিমদের খুন করছে। ধর্মের নামে উস্কানি দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাচ্ছে।

ফলে বিজেপিকে সমর্থন করা মানে গোটা নবজাগরণ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকেই অস্বীকার করা। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, নেতাজিদের অস্বীকার করা। কারণ এঁদের চিন্তা ও নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী বিজেপির নীতি ও চিন্তা।

সিপিএমের অ-বাম ভূমিকা

বিজেপির ফ্যাসিস্ট নীতির বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে প্রয়োজন ছিল শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এসইউসিআই-কমিউনিস্টের সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ সিপিএমের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাটকে চিঠি দেন। তার ভিত্তিতে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ভাবে ৬টি বামপন্থী দলের জোট গড়ে ওঠে। জোটের পক্ষ থেকে আমরা দেশজোড়া জঙ্গি বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাই। কিন্তু সিপিএম ডেপুটেশন, অবস্থানের বাইরে আর কোনও আন্দোলনে আসতে চায় না। অন্য দিকে কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে থাকে। আমরা এ দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির বিশ্বস্ত দল কংগ্রেসের সাথে এই ঘনিষ্ঠতার বিরোধিতা করি। হঠাৎই দেখা যায়, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা তুলে দেওয়ার প্রশ্নে তাঁরা এসইউসিআই(সি)-কে বাদ দিয়ে বিবৃতি দিল।

পশ্চিমবাংলা এবং ত্রিপুরায় ক্ষমতা হারানোর পর সংসদীয় রাজনীতিতে সিপিএমের অস্তিত্ব সঙ্কট দেখা দেয়। এরপরই যে কোনও ভাবে হোক এমএলএ-এমপি বাড়ানোর তাগিদে তারা কংগ্রেসের সাথে জোট ঘোষণা করে। এস ইউ সি আই-সির সঙ্গে জোটে থাকলে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে যাওয়া যেত না। তাই তারা কোনও রকম রীতি-নীতি-শিষ্টাচারের তোয়াক্কা না করেই ছ'পার্টির জোট ভেঙে দেয়।

সাম্প্রদায়িক জোট

ভোট রাজনীতি সিপিএমকে আজ এত নিচে নামিয়েছে যে, বামপন্থার কোনও তোয়াক্কা না করে কংগ্রেসের পাশাপাশি মুসলিম মৌলবাদী আব্বাস সিদ্দিকির নতুন গড়ে ওঠা দলের সঙ্গেও জোট গড়ে তুলতে এতটুকু বাধল না। সিপিএম এ রাজ্যে ৩৪ বছরের শাসনে গণআন্দোলনের রাস্তা শুধু ত্যাগ করেছিল তাই নয়, গণআন্দোলনকে পুঁজিবাদী কায়দাতেই দমন করেছিল। ফলে গণআন্দোলনের পথে মানুষের আস্থা অর্জন করে মানুষের সমর্থন আদায়ের ক্ষমতা তারা হারিয়েছে। তাই শুধুমাত্র সংখ্যালঘু ভোটের

তিনের পাতায় দেখুন

ফাঁপা বুলিতে ভুলবেন না

দুয়ের পাতার পর

লোভে তারা এমন একটি ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির সাথে সামিল হয়ে গেল। আশার কথা, দলের নিচের তলায় যাঁদের মধ্যে এখনও কিছুটা বামপন্থার চর্চা রয়েছে, তাঁরা এই নীতিহীন জোটের বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করছে। শিক্ষিত যুক্তিবাদী মানুষ মাত্রেই এই জোটের তীব্র নিন্দা করছেন। এই অবস্থায় দলের নেতারা জোটের পক্ষে সাফাই গাইতে প্রতিদিন গণশক্তিতে লম্বা লম্বা নিবন্ধ লিখে জোটের যৌক্তিকতা ব্যাখা করছেন। মার্কস-লেনিনের লেখার এখান ওখান থেকে উদ্ধৃতি তুলে এনে প্রমাণ করতে চাইছেন তাঁদের এই আচরণ মার্কসবাদসম্মত। এই ভাবে বারে বারেই তাঁরা তাঁদের নীতিহীন আচরণের দ্বারা মার্কবাদকে কলঙ্কিত করেছেন এবং মানুষের চোখে তাকে হেয় করেছেন।

অন্য দিকে এই সাম্প্রদায়িক জোটের দ্বারা তাঁরা সংখ্যালঘু মৌলবাদকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিচ্ছেন, যার ফলে পাল্টা হিন্দু মৌলবাদও শক্তিশালী হবে। এর মূল্য শুধু তাঁদের দলকেই দিতে হবে না, এ রাজ্যের মানুষকেও দিতে হবে কড়ায়-গণ্ডায়। এর ফলে সিপিএমের যুক্তিহীন, গোঁড়া কর্মী-সমর্থক অংশটি পার্টি-নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে বিনা তর্কে, বিনা বিচারে মেনে নিয়ে তার পক্ষে যুক্তি করতে থাকবে। পাশাপাশি তাদের সমর্থকদের একটি অংশও এর দ্বারা প্রভাবিত হবে। অথচ এ রাজ্যের সংখ্যালঘু মানুষেরা তাঁদের জীবনের সমস্যাগুলিকে কখনওই বিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁদের গোষ্ঠীর সমস্যা হিসাবে দেখেননি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের সমস্যা হিসাবেই দেখেছেন এবং তার সমাধানও গণতান্ত্রিক পথে, গণআন্দোলনের পথেই করার চেষ্টা করেছেন। সেই অবস্থান থেকে সিপিএম নেতারা ভোটরাজনীতির সংকীর্ণ স্বার্থে তাঁদের একটি অংশকে হলেও সরিয়ে আনলেন। এর দ্বারা রাজ্যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সিংহদরজা তাঁরা খুলে দিলেন।

কংগ্রেস মুখে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললেও কখনওই এই নীতি অনুসরণ করেনি। তার ফল হিসাবে কংগ্রেস স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুধু মুসলমানদেরই সরিয়ে দেয়নি, নেতৃত্বের মধ্যে উচ্চবর্ণের মানসিকতা থাকায় তা নিম্নবর্ণের মানুষদের সমাজের মূল ধারার সাথে যুক্ত হতে দেয়নি। এরই ফল দেশবিভাগ। স্বাধীন ভারতেও কংগ্রেস সঙ্কীর্ণ ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির স্বার্থে বিহারের ভাগলপুরে দাঙ্গা ঘটিয়েছে, এ কারণেই আসামের নেলিতে সংখ্যালঘু গণহত্যা হয়েছে, দিল্লিতে শিখ গণহত্যা হয়েছে। কংগ্রেস নেতা রাজীব গান্ধী সঙ্কীর্ণ ভোট রাজনীতির স্বার্থে হিন্দু ভোটব্যাঙ্কের লোভে রামমন্দিরের তালা খুলে দিয়েছিলেন। সেই রামমন্দির রাজনীতিকে পুঁজি করেই বিজেপির আজকের এই রমরমা। বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম এবং গণআন্দোলন গড়ে তুলতে বামপন্থী ঐক্য গড়ে তোলার পরিবর্তে কংগ্রেসকেই লড়াইয়ের সাথী করেছে সিপিএম। এর থেকেই স্পষ্ট বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে কেমন লড়াই তাঁরা লড়তে চান।

বিজেপির বিরুদ্ধে সিপিএমের লড়াইটা কতখানি মেকি তা আরও স্পষ্ট হয়ে যায় তাদের 'আগে রাম পরে বাম' স্লোগানে। অর্থাৎ বিজেপিকে সমর্থন করে আগে তৃণমূলকে হারাও, তারপর বিজেপিকে হারিয়ে সিপিএম ক্ষমতায় ফিরবে। এই নীতিতেই গত লোকসভা নির্বাচনে সিপিএমের সমর্থনে বিজেপি রাজ্যে ১৮টি আসনে জয়ী হয়। শুধু দলে দলে কর্মী-সমর্থকরাই নয়, নেতারাও সব গিয়ে বিজেপিতে ভিড়তে থাকেন। সিপিএমের সমর্থন এক ধাক্কায় তলানিতে এসে ঠেকে। সেই সিপিএম এখন ভোট বাড়াতে মুসলিম মৌলবাদের সমর্থন নিচ্ছে।

বাস্তবে নামের পাশে মার্কসবাদী থাকলেও এই দলটিতে যথার্থ মার্কসবাদের চর্চা কোনও দিনই হয়নি। যতদিন তারা বিরোধী অবস্থানে ছিল ততদিন গণআন্দোলনের মধ্যে কিছুটা থাকলেও এ রাজ্যে '৭৭ সালে ক্ষমতায় যাওয়ার পর গণআন্দোলনকে পুরোপুরি ত্যাগ করে অন্য পাঁচটি শাসক দলের মতোই একটি সংসদীয় শাসক দলে পরিণত হয়ে যায় সিপিএম। সমাজ পরিবর্তন, গণআন্দোলনের পরিবর্তে এমএলএ, এমপি, ক্ষমতা, গদিতেই অভ্যস্ত হয়ে যায়। সরকারি গদি দখলই হয়ে যায় গোটা দলের একমাত্র লক্ষ্য। যে করে হোক, প্রয়োজনে নীতিহীন পথেও ভোটে জিতে ক্ষমতা দখল করাই হয়ে যায় একমাত্র লক্ষ্য। বিহারে আরজেডি, তামিলনাড়ুতে ডিএমকে এবং নানা রাজ্যে জাতপাতবাদী দলগুলির সাথে জোট গড়ে তুলতে তাদের অসুবিধা হয়নি। আজও তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ, সাম্প্রদায়িক কংগ্রেস কিংবা আইএসএফের সঙ্গে জোট গড়ে তোলা একই উদ্দেশ্যে। এর সঙ্গে জনস্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই, বামপন্থার কোনও সম্পর্ক নেই।

শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের স্বার্থে
গণআন্দোলনের নেতৃত্বে একা এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)

এই অবস্থায় এসইউসিআই-কমিউনিস্ট একাই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনগুলি সংগঠিত করে চলেছে। এই গণআন্দোলনের ধারাবাহিকতাতেই এ রাজ্যের নির্বাচনে একাই ১৯৩টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। একটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টির কাছে নির্বাচনও একটি গণআন্দোলন। শ্রেণি সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এই দল নির্বাচনে অংশ নেয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা অনুযায়ী এসইউসিআই-কমিউনিস্ট জানে, পুঁজিবাদী এই সমাজ ব্যবস্থায় সমাজ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি ও শোষিত সর্বহারা শ্রেণি। ফলে দুই শ্রেণির একই দল হতে পারে না। দল মানেই শ্রেণি দল। হয় পুঁজিপতি শ্রেণির দল, না হয় শোষিত শ্রেণির দল। অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট যে আমাদের দেশের ভোটবাজ দলগুলি সবই শাসক শ্রেণির দল— তা তার পতাকার রঙ তেরঙা, লাল বা গেরুয়া যা-ই হোক না কেন। তা হলে শোষিত শ্রেণির দল কোনটি?

পুঁজিপতি শ্রেণির দল অনেকগুলি থাকলেও শোষিত শ্রেণির দল একটিই— ভারতের বুকে তা একমাত্র এসইউসিআই-কমিউনিস্ট। শোষিত শ্রেণির দল বলেই সে জানে পুঁজিবাদী এই শাসন কাঠামোকে টিকিয়ে রেখে নির্বাচনের দ্বারা শুধুমাত্র সরকার পাল্টে শোষিত মানুষের দুরবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটানো যাবে না। তা হলে এসইউসিআই-কমিউনিস্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে কেন? করে তার কারণ, মার্কসবাদ লেনিনবাদের এই মূল্যবান শিক্ষাটি সম্পর্কে কমিউনিস্টরা সচেতন হলেও জনগণের, শ্রমিক শ্রেণির পার্লামেন্ট তথা নির্বাচন সম্পর্কে এখনও মোহমুক্তি ঘটেনি। লেনিন বলেছেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পাঁচ বছর অন্তর বুর্জোয়ারা যে নির্বাচন করে তার উদ্দেশ্য, বুর্জোয়া শ্রেণির গোলাম হিসাবে, ম্যানেজার হিসাবে কারা কাজ করবে তা নির্ধারণ করা। এ সত্ত্বেও কেন বিপ্লবীরা নির্বাচনে নামে? এর উদ্দেশ্য জনগণের সঙ্গে থেকে জনগণকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করা, পার্লামেন্টোরি তথা নির্বাচনী মোহ থেকে মুক্ত করা, বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করা। এই উদ্দেশ্য নিয়েই বিপ্লবীরা নির্বাচনে অংশ নেয়।

নির্বাচনে বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি

মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ বলেছেন, নির্বাচন হল একটা বুর্জোয়া রাজনীতি। জনগণের রাজনৈতিক চেতনা না থাকলে, শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম এবং সংগঠন না থাকলে, গণআন্দোলন না থাকলে, জনগণের সচেতন সংঘবদ্ধ শক্তি না থাকলে বড় বড় শিল্পপতিরা, প্রতিক্রিয়াশীলরা, বিপুল টাকা ঢেলে এবং সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে নির্বাচনের পক্ষে যে হাওয়া তোলে, যে আবহাওয়া তৈরি করে, জনগণ উলুখাগড়ার মতো সেই দিকে ভেসে যায়। তিনি বলছেন, যতদিন বিপ্লব না হয়, জনগণ ইলেকশন চাক বা না চাক, পছন্দ করুক আর নাই করুক, ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, জনগণকে নির্বাচনে টেনে আনা হয়। জনতাও এসে যায়। তিনি বলছেন, বিপ্লব মানে হল, যখন জনতা বুঝে ফেলেছে, নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা নেই, যখন সকলে এই চেতনার ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে গেছে এবং সচেতন ভাবে সংগঠিত হয়ে নির্বাচন বয়কট করছে। এই বয়কটটাও নেগেটিভলি নয়, পজিটিভলি। অর্থাৎ গণঅভ্যুত্থান করার জায়গায় সে চলে গেছে, যখন সে বলে, না নির্বাচন নয় এবং সংগঠিত ভাবে ক্ষমতা দখলের জায়গায় চলে যায় তখনই নির্বাচন অকার্যকরী হয়ে যায়। না হলে নির্বাচনে জনতা বারবার ফেঁসে যায়, আর জনতার সঙ্গে থাকার জন্যই বিপ্লবীদের নির্বাচনে যেতে হয়।

নির্বাচনে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি

নির্বাচনে বিপ্লবীদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে? সেটা কি বুর্জোয়া দলগুলোর মতোই? যে করে হোক যত বেশি সিট দখল করা? কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা হল, জনগণকে একটা বিপ্লবী গণসংগ্রামের (মাস-রেভোলিউশনারি) লাইনের ভিত্তিতে নির্বাচনে লড়াই করতে শেখানোটাই বিপ্লবীদের কাজ। তিনি বলছেন, এটা করতে গিয়ে যদি সবচেয়ে বেশি সিট পাই পাব, যদি একটাও সিট না পাই না পাব। কিন্তু তার মূল উদ্দেশ্যটা কখনওই যে-কোনও প্রকারে কতকগুলি সিট দখল করা নয়। বুর্জোয়া দলগুলি যে ভাবে নির্বাচন পরিচালনা করে, যে ভাবে সিট দখল করে বিপ্লবীরা সেভাবে নির্বাচনে লড়াই করতে পারে না। এতে বিপ্লবী থাকা যায় না। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডও এগোয় না। এর দ্বারা বুর্জোয়া রাজনীতির ভণ্ডামিটাকেও উন্মোচিত করা যায় না। এ কথাটা মুখে বলা আর কাজে করাটা এক জিনিস নয়। কারা এটা শুধু মুখে বলছে, আর কারা এটা কার্যকরী করছে সেটা জনগণকে বুঝিয়ে সচেতন করাই বিপ্লবীদের কাজ। এসইউসিআই-কমিউনিস্ট এই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

জনগণের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে গণআন্দোলনের একমাত্র শক্তি যে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) এ বিষয়টি এ রাজ্যের মানুষের কাছে স্পষ্ট। কিন্তু তাঁরা বলেন, তোমরা ভাল, কিন্তু নির্বাচনে জিতবে না। তা হলে কে জিতবে? নিশ্চয় যারা মন্দ। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ, যে হাজারটা সমস্যায় জর্জরিত, তার সেই সমস্যাগুলো নিয়ে লড়াই করছে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)। তা হলে সব জেনেও একটা মন্দ দলকে মানুষ ভোট দেবে কেন, তাদের জেতাবে কেন? প্রতিবার মানুষ ভোট দেয়, আর জেতে এই সব মন্দ, দুর্নীতিগ্রস্ত, নীতিহীন, মালিকদের গোলাম দলগুলো। জনগণ জেতে কি? বুর্জোয়াদের টাকার থলি এবং তাদের পরিচালিত মিডিয়া হাওয়া তুলে দেয় কে জিতবে, কে সরকার গড়বে? কিন্তু তা নিয়ে সাধারণ মানুষের কীসের মাথাব্যথা? দেশে কি এইটাই সমস্যা যে, দেশে কোনও সরকার নেই? সরকার তো আছেই। একটা সরকার যায়, আর একটা সরকার আসে। সব সরকারই যে নীতি নেয়, যে আইন নিয়ে আসে সব সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে। তারা ক্ষমতায় বসে জিনিসপত্রের দাম বাড়ায়, নিত্য-নতুন কর বসায়, সরকারি সম্পত্তি বেচে দেয়। তা হলে সেই সরকারে কে বসছে তা নিয়ে জনসাধারণের আগ্রহ থাকার কারণ কিছু আছে কি? আসল কথা হল, জনজীবনের সমস্যা কী, আর তা নিয়ে কে লড়াই করছে? সেই শক্তি কি একমাত্র এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) নয়? দেশের শ্রমিক-কৃষক-গরিব-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্তের যথার্থ বন্ধু আর কে আছে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) ছাড়া? নির্বাচনের মঞ্চে দাঁড়িয়েও এই দল পুঁজিবাদী রাজনীতির আসল রূপটাকে যে ভাবে তুলে ধরছে, তা কি আর কেউ সে ভাবে ধরছে? না, ধরছে না। ধরতে পারে না। কারণ তারা নিজেরাই অপরাধী।

আজ আরও একটি মর্মান্তিক বিষয়কে কেউ এড়িয়ে যেতে পারেন না যে, প্রতিটি পরিবারে ছেলে-মেয়েরা কী ভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অল্প বয়সেই যৌন-বিকৃতির শিকার হয়ে যাচ্ছে। মদ-ড্রাগে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। এদের বাঁচানোর কথা কি কেউ ভাবছে? পুঁজিবাদী দলগুলি দেশের ছাত্র-যুবকদের নৈতিক চরিত্রকে ধসিয়ে দিচ্ছে, তাদের অসৎ করে তুলছে, তাদের নষ্ট করছে। টাকার বিনিময়ে তাদের ভোটের কাজে লাগাচ্ছে। ফলে তারা ঠিক-বেঠিক, ভাল-মন্দ বিচার করতে শিখছে না, তারা এই সব দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতাদের গোলাম হিসাবে কাজ করছে। এর বিরুদ্ধে কে লড়াই করছে? একমাত্র এসইউসিআই-কমিউনিস্ট। ছাত্র-যুবদের মধ্যে মূল্যবোধ-নীতিবোধ গড়ে তুলতে নবজাগরণ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের মনীষীদের জীবন-সংগ্রামকে ছাত্র-যুবদের মধ্যে তুলে ধরছে একমাত্র এসইউসিআই (সি)। এসইউসিআই (সি)-কে সমর্থন মানে যেমন গণআন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি, তেমনই দেশের ছাত্র-যুবদের নৈতিক অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষার সংগ্রামের শক্তিবৃদ্ধি। ফলে এই সব ভোটবাজ দলগুলির মিথ্যা ফাঁপা বুলিতে না ভুলে জনগণের জীবনের সংগ্রামের সাথীকে চিনে নিতে হবে।

যথাযথ স্বীকৃতির দাবিতে বাইক ট্যাক্সি চালকদের বিক্ষোভ

কলকাতা এবং শহরতলিতে বর্তমানে ১০ হাজারের বেশি, যুবক-যুবতী অ্যাপ নির্ভর বাইকট্যাক্সি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত। সাধারণ ট্যাক্সি থেকে কিছুটা সস্তা হওয়ায় এই পরিষেবা জনপ্রিয় হচ্ছে। রাজ্য সরকার ওলা, উবের, র‍্যাপিডো ইত্যাদি বহুজাতিক 'অ্যাপক্যাব' সংস্থাকে এই পরিষেবার অনুমতিও দিয়েছে। অথচ বাইক চালক যারা সংস্থার হয়ে যাত্রী পরিবহণ করছেন তাঁদের গাড়ির নাম্বার প্লেট কমার্শিয়াল নয় বলে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করছে পুলিশ। যদিও কমার্শিয়াল লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেও চালকরা তা পাচ্ছেন না। কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মোটর ভেহিকেল আইনে ব্যক্তিগত বাইক চালকরা কমার্শিয়াল লাইসেন্স পান না। কমপক্ষে ১৫ জন একযোগে কোম্পানি না খুললে কমার্শিয়াল লাইসেন্স পাওয়া যায় না।

এই আইন পরিবর্তন করে বাইক ট্যাক্সি চালকদের আইনি স্বীকৃতি, পুলিশি হয়রানি বন্ধ, পরিবহণ শ্রমিক হিসাবে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির দাবিতে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত কলকাতা সাবারবান বাইক-ট্যাক্সি অপারেটর ইউনিয়ন আন্দোলন করে চলেছে। ২ মার্চ কলকাতায় বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন বাইক-ট্যাক্সি চালকরা। ইউনিয়নের সভাপতি শান্তি ঘোষ ও সম্পাদক বিজয় সরকারের নেতৃত্বে লালবাজারে ডিসি (ট্র্যাফিক)-এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অবস্থানে বহু বাইক-ট্যাক্সি চালক এবং অন্যান্য পেশার শ্রমিক-প্রতিনিধিরাও বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বলেন লকডাউন পরবর্তী সময়ে বহু মানুষেরই রোজগারের পথ এই বাইক-ট্যাক্সি। অবিলম্বে ন্যায্য দাবি মানা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছে ইউনিয়ন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি মকুবের দাবি ডিএসও-র

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে বাংলা, ইতিহাস, মিউজিওলজি সহ একাধিক বিভাগে অযৌক্তিক ফি আদায় চলছে। এর প্রতিবাদে ১ মার্চ এআইডিএসও-র চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল সহ-উপাচার্যের (শিক্ষা) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্ত রকম ফি মকুবের দাবি জানায়।

সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক আবু সাঈদ বলেন, করোনা অতিমারির কারণে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় এক বছর ধরে বন্ধ ছিল সেখানে স্কলারশিপের জন্য ভর্তির রিসিপ্ট আপলোড করার নামে বাঁকা পথে যেভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের ফি জমা করতে বাধ্য করা হচ্ছে তা অত্যন্ত অন্যায়। কোনওরকম ক্লাসরুম পঠন-পাঠন না হওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের ফি আদায়ের এই প্রচেষ্টা অযৌক্তিক। বহু ছাত্র-ছাত্রী স্কলারশিপের ফর্ম পূরণ করার জন্য ১৮ মাস, ১২ মাস, ৬ মাসের টিউশন ফি ইতিমধ্যেই জমা দিতে বাধ্য হয়েছে। আন্দোলনের চাপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ ফি মকুব করেছেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন এখনও পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও ফি মকুব করার নির্দেশিকা জারি করছে না, তার প্রতিবাদ জানায় ডিএসও। ছাত্র আন্দোলনের চাপে সহ-উপাচার্য ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন যে অতি দ্রুত বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানদের কোনওরকম ফি না নেওয়ার নির্দেশিকা পাঠাবেন এবং ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানদের সাথে ফোন মারফৎ কথাও বলেছেন বলে সচিব জানিয়েছেন।

পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মেলন

হাওড়ায় উলুবেড়িয়ার গঙ্গারামপুরে ৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হল পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বিতীয় সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী সুচেতা কুণ্ডু, এআইইউটিইউসি-র পক্ষে নিখিল বেরা প্রমুখ। বাসন্তী সাহাকে সভানেত্রী এবং মৌমিতা পুরোহিত ও শিল্পা দে-কে যুগ্ম সম্পাদক করে নতুন কমিটি গঠিত হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুরের শতাধিক গ্রামে এআইকেকেএমএস-এর কৃষক কমিটি

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তিনটি কালা কৃষি আইন বাতিল সহ অন্যান্য দাবিতে দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের উদ্যোগে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ধরনা, সাইকেল র‍্যালি, বাইক র‍্যালি, ট্রাক্টর র‍্যালি, রাস্তা অবরোধ, রেল অবরোধ, চাক্কা জ্যাম,কালা আইনের প্রতিলিপি পোড়ানো ও কৃষক আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে শহিদবেদি স্থাপন করে প্রতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় তিন শতাধিক গ্রাম প্রচার এবং শতাধিক কমিটি গঠনের পর ব্লকে ব্লকে সম্মেলন বা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি শালবনি ব্লক, ১৪ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগড়-১ ব্লক, নারায়ণগড়-২ ব্লক, ২১ ফেব্রুয়ারি মেদিনীপুর সদর ব্লক এবং ঝাড়গ্রাম ব্লক, ২৫ ফেব্রুয়ারি লালগড় (বিনপুর-১) ব্লক, বেলপাহাড়ি ব্লকে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

রাস্তায় আলু ফেলে বিক্ষোভ চাষিদের

আলুর উপযুক্ত দাম না পেয়ে রাজ্যের আলুচাষিরা গভীর সঙ্কটে দিন কাটাচ্ছেন। ৭ মার্চ হুগলির তারকেশ্বরে চাউলপট্টি মোড়ে কৃষক সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে আলুর দাম ন্যূনতম ৬০০ টাকা প্যাকেট (৫০কেজি) করার দাবিতে আলুচাষিরা রাস্তায় আলু ফেলে বিক্ষোভ দেখান ও পথ অবরোধ করেন।

আলুচাষি মহাদেব কোলে, নুর মোহম্মদ বলেন, এ বছর পাঁচ হাজার থেকে সাড়ে ছয় হাজার টাকা দামে আলুর বীজ কিনতে হয়েছে। সেচের জল, কীটনাশক, সারের দাম ব্যাপকভাবে বেড়েছে। যেখানে অন্য বছর এক বিঘা আলু চাষ করতে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা খরচ হত, এ বছর সেখানে বিঘা প্রতি আলু চাষে ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এখন আলু ওঠার সময় তাঁরা আলুর দাম পাচ্ছেন না। বিঘা প্রতি প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা লোকসান করে আলু বিক্রি করতে হচ্ছে। তারকেশ্বরের আলুচাষি অমর সামন্ত বলেন, ৭ বিঘা জমি লোন নিয়ে আলু চাষ করেছি, এখন ৩-৪ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করতে হচ্ছে। কী ভাবে ধার শোধ করব জানি না। আলুর দাম না পেলে বাঁচব কী করে জানি না। ভাগচাষি সুনীল সানা বলেন, নেতারা শুধু ভোটের সময় ভোট চাইতে আসে। আমাদের মতো গরিব কী খাবে, কী ভাবে বাঁচবে তা নিয়ে কারও মাথাব্যাথা নেই।

সংগঠনের আহ্বায়ক অমিতা বাগ বলেন, অন্যান্য বছরের মতো এবারও আলুচাষিরা দাম পাচ্ছেন না। অথচ চাষির হাত থেকে আলু চলে যাওয়ার পর বাজারে আলুর দাম ব্যাপক বাড়ে, সাধারণ মানুষকে দশগুণ দামে আলু কিনে খেতে হয়। এই বছরও সাধারণ মানুষকে ৪০ টাকা কেজি দরে আলু কিনে খেতে হয়েছে। এই অবস্থায় চাষিদের দাবি, সরকারকে উপযুক্ত দামে কৃষকের কাছ থেকে আলু কিনে সাধারণ মানুষকে গণবণ্টনের মাধ্যমে ন্যায্য দামে তা বিক্রি করতে হবে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন কৃষি আইন চালু হলে কালোবাজারি-মজুতদারি ও চাল-ডাল-সব্জির দাম ব্যাপক ভাবে বাড়বে। চাষি সহ সাধারণ মানুষ মরবে, পকেট ভরবে কেবল আম্বানি-আদানিদের। এর বিরুদ্ধে দিল্লিতে যে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন চলছে, আমরা তার প্রতি সংহতি জানাচ্ছি।

বৃত্তিপ্রাপকদের সংবর্ধনা ও বৃত্তি দেওয়া হল

২৮ বছর ধরে সাধারণ মানুষের সাহায্য ও সমর্থনে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ (পশ্চিমবঙ্গ)-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা(বৃত্তি)। ৩ মার্চ হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় ২৮ জন বৃত্তিপ্রাপক ছাত্রছাত্রীকে উলুবেড়িয়া ইনস্টিটিউট অ্যান্ড লাইব্রেরি হলে সংবর্ধনা ও বৃত্তি দেওয়া হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অরূপ রতন সাহা। প্রধান বক্তা ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের রাজ্য সহ-সম্পাদিকা অধ্যাপিকা অনুরূপা দাস। শিক্ষক, অধ্যাপক সহ এলাকার বহু বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

বাঙ্গালোরে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিশাল বিক্ষোভ

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের গ্রুপ সি এবং ডি কর্মীর স্বীকৃতির দাবি জানাল কর্ণাটক রাজ্য সংযুক্ত অঙ্গনওয়াড়ি নউকারারা সংঘ। এআইইউটিইউসি অনুমোদিত এই সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড সোমশেখর ইয়াদগিরি বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা গ্রুপ সি এবং ডি স্তরের কর্মীদের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কাজেই তাঁরা এই স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রমা টিসি বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ২৫ হাজার টাকা এবং সহায়কদের ২১ হাজার টাকা মজুরি দিতে হবে। ২ মার্চ বাঙ্গালোর সিটি পার্কে এক জমায়েতে এ কথা বলেন তাঁরা। এআইইউটিইউসির রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড কে ভি ভাট বলেন, ৭ বছর ধরে বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় থাকলেও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করেনি। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সহ সভাপতি কমরেড ডি উমাদেবী। মন্ত্রী বিক্ষোভস্থলে এসে দাবিপত্র গ্রহণ করেন।

পাঞ্জাবে সেভ এডুকেশন কমিটি গঠিত

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র মধ্য দিয়ে শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ এবং রাজ্যের ভূমিকা খর্ব করে চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণের যে অপচেষ্টা চলছে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর করতে ২১ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবের লুধিয়ানার তারা সিংহ কলেজে এক রাজ্যস্তরীয় শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

কনভেনশনে বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের দিল্লি রাজ্য কমিটির যুগ্ম সম্পাদক প্রাক্তন অধ্যক্ষ সারদা দীক্ষিত। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ কুলদীপ সিংহ, অধ্যক্ষ কিরণদীপ কাউর, অধ্যাপক মোহম্মদ দাউদ আলম। কনভেনশন পরিচালনা করেন শিক্ষক গুরদীপ সিং বেহনিয়াল।

অমৃতসর মেডিকেল কলেজের এমেরিটাস অধ্যাপক ডঃ শ্যামসুন্দর দীপ্তিকে সভাপতি, অধ্যাপক অমিন্দর পাল সিংহকে সম্পাদক, শিক্ষক কিরণজিৎ কউরকে কোষাধ্যক্ষ করে নতুন কমিটি গঠিত হয়। এই কনভেনশন প্রস্তুতির সময় বিভিন্ন জেলায় যে সমস্ত যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে তাদের নিয়ে জেলা ভিত্তিক শিক্ষা কনভেনশন এবং গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

ওড়িশায় ব্লক অফিস অভিযান

২০টি সরকারি প্রাথমিক স্কুল বন্ধ করে দেওয়া ও কৃষক স্বার্থবিরোধী কৃষি আইন ২০২০-র প্রতিবাদে এসইউসিআই (সি) -র পক্ষ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি ওড়িশার জাজপুর জেলার বিনঝাঁপুর ব্লক অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

আশাকর্মীদের মাথাভাঙা ব্লক সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের কোচবিহারের মাথাভাঙা ২নং ব্লকের তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২১ ফেব্রুয়ারি, ছেঁড়ামারী শরৎচন্দ্র পাঠভবনে। ৬২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের বিশিষ্ট সংগঠক রীনা ঘোষ, সাগর চৌধুরী এবং এআইইউটিইউসি-র জেলা সম্পাদক বিপুল ঘোষ।

বাকস্বাধীনতা হরণকারী ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন

আন্দোলনে উত্তাল বাংলাদেশ

বাক স্বাধীনতাবিরোধী 'ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট' বাতিলের দাবিতে আন্দোলনমুখর বাংলাদেশ। এই কালা আইনের মাধ্যমে সাংবাদিক লেখক-কার্টুনিস্ট-শিক্ষক-রাজনৈতিক কর্মী থেকে শুরু করে স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রকে পর্যন্ত গ্রেফতার করা হচ্ছে। সরকারের বিরুদ্ধে সারা দেশের মানুষের অসন্তোষকে প্রতিবাদে পরিণত হতে দিতে চায় না আওয়ামি লিগ সরকার। তাই এ ধরনের জঙ্গলের আইন আওয়ামি লিগ সরকার পাশ করিয়েছে ও যথেচ্ছ ব্যবহার করছে। করোনাকালীন সময়ে সরকারের অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির নগ্ন চেহারা প্রকাশের পর থেকে এই আক্রমণ তীব্রতা পেয়েছে।

এ আইন নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ চললেও তীব্র রূপ পায় গত ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে। সেদিন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে বন্দি থাকা লেখক মুশতাক মারা যান। কারাগারে নির্যাতন ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না পাওয়ার কারণে তিনি মারা যান এ বিষয়ে নিশ্চিত বাংলাদেশের মানুষ। তাঁর মৃত্যুর খবর শোনার সাথে সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্ররা জড়ো হতে থাকে। সেদিন রাত সাড়ে ১২টায় বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে ছাত্ররা মিছিল বের করে।

পরদিন ২৬ ফেব্রুয়ারি ক্যাম্পাস ছিল উত্তাল। সারাদিনব্যাপী ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ চলতে থাকে। সন্ধ্যায় বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে মশাল মিছিল বের হলে শাহবাগ মোড়ে পুলিশ মিছিলের উপর নির্মমভাবে হামলা চালায়। এতে অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী আহত হন। পুলিশ সেদিন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও ছাত্র ইউনিয়নের সাতজন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। পুলিশকে হত্যার চেষ্টা সহ দশটি ধারায় তাদের নামে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়। তাঁরা এখনও কারাগারে। এরই মধ্যে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে খুলনায় শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনতা ঐক্যের সংগঠক রুহুল আমিনকে দুই দিনের রিমান্ডে পুলিশ গ্রেফতার করে।

মূলত বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে এই আন্দোলন শুরু হলেও প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। সারা দেশের সচেতন মানুষ এই আন্দোলনে নৈতিক সমর্থন ব্যক্ত করছেন। গত ৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের শীর্ষ সংবাদপত্রগুলোতে এ আইনের বিরুদ্ধে ও গ্রেফতার হওয়া নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবিতে দেশের ৬৬ জন লেখকের বিবৃতি ছাপা হয়েছে। আওয়ামি লিগ ও তাদের জোটসঙ্গী ব্যতীত প্রায় সকল রাজনৈতিক দল এই আইন প্রত্যাখ্যান করেছে।

মুশতাককে গ্রেফতারের পর তাঁকে ১০ মাস কারাগারে আটকে রাখা হয়। ছ'বার তাঁর জামিন আবেদন নামঞ্জুর করা হয়। মুশতাকের সাথে কবীর কিশোর নামের এক কার্টুনিস্টকেও গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। মুশতাকের মৃত্যুর পর আন্দোলনের চাপে গত ৪ মার্চ কিশোরকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

কিশোরকে গ্রেফতারের পর ৬৯ ঘন্টা তাঁকে গ্রেফতার দেখানো হয়নি। কিশোর-মুশতাকের সাথে গ্রেফতার হওয়া রাজনৈতিক কর্মী, রাষ্ট্রচিন্তার সংগঠক দিদারুল ভুঁইয়াকে গ্রেফতারের পর ২৪ ঘন্টা তাঁর কোনও হদিস পাওয়া যায়নি।

সাদা পোশাকে যখন তখন বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া ও গ্রেফতার না দেখিয়ে কখনও গুম করে ফেলা, কখনও পরে গ্রেফতার দেখানো বাংলাদেশে পুলিশের কাছে এখন প্রায় স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। অনেকের ভাষ্যমতে, পাকিস্তান আমলে গভীর রাতে বাসা বা কোয়ার্টার থেকে শিক্ষক গ্রেফতার খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশে এই বিকট রীতি আবার ফিরে এসেছে বা আসা শুরু করেছে।

গুজরাট রাজ্য বাজেটে জনগণের প্রতি প্রতারণা

'ফাঁকা কলসি বাজে বেশি'— গুজরাট রাজ্য বাজেট সম্পর্কে এক কথায় এমনই প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন এসইউসিআই(সি) গুজরাট রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড মীনাক্ষী যোশী। তিনি বলেন, বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ২.২৭ লক্ষ কোটি টাকা। টাকার এই পরিমাণ গত বছরের বরাদ্দ ২ .১৫ লক্ষ কোটি থেকে সামান্য বেশি হলেও মুদ্রাস্ফীতির বিবেচনায় একে বৃদ্ধি না বলে হ্রাস বলাই ভাল। রাজ্য সরকার বাজেটে পাঁচ বছরে ২ লাখ চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আর বাস্তব হল, শুধু ২০১৯ সালেই ৪ লাখ ৫৩ হাজার বেকার যুবক নাম নথিভুক্ত করেছে।

এই বাজেটের সবচেয়ে জঘন্য দিক হল কোভিড-১৯ অতিমারিতে বিপর্যস্ত মানুষদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বরাদ্দ করা হয়নি। কমরেড যোশী এর বিরুদ্ধে গুজরাটের সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

পাঠকের মতামত

ভিড়েই বিপদ

২৮ ফেব্রুয়ারি ব্রিগেডের ভিড় দেখে আপনি হয়তো উচ্ছ্বসিত, কিন্তু আমি আতঙ্কিত। বিপদ ওই ভিড়েই। সরাসরি প্রশ্ন করুন, আপনারা কী চান? উত্তর সরল এবং সংক্ষিপ্ত— 'ভোট'।

দীর্ঘ ৩৪ বছর পশ্চিমবাংলায়, ২৫ বছর ত্রিপুরায়, বিভিন্ন নামে ও জোটে কয়েক দশক কেরালায় ক্ষমতায় থাকা সিপিএম কী দিয়েছে?

জনগণের চিন্তা চেতনা-শিক্ষার মেরুদণ্ড তারা ভেঙে দিয়েছে। 'উন্নয়ন' যা করেছে সেটা যে কোনও দলের সরকার থাকলেই কম বেশি করত। দুর্নীতি, ঔদ্ধত্য, দলবাজি— এসব ব্যাপারেও তাদের অবদান অন্যদের চেয়ে কম নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশি-ই। তবে চাতুর্য এক্ষেত্রে প্রসংশনীয়। অন্যরা বেফাঁস, বেলাগাম। শ্রমের ন্যায্য অধিকার, পরিপূর্ণ মানুষের মতো বাঁচার অধিকার— এগুলো বাম নেতারা ক্ষমতায় গিয়ে শুধু স্লোগানে রেখেছিলেন। বাস্তবে কিছু প্রশাসনিক সুবিধে পাইয়ে দিয়ে একটা বিপুল ভোটব্যাংক তৈরি ও তাকে রক্ষা করতেই ব্যস্ত থেকেছেন। এ দিনের ভিড়ের একটা বড় অংশের লক্ষ্য আবারও ক্ষমতায় যাবো এবং করেকম্মে খাবো। এর অতিরিক্ত কোনও আকাঙ্ক্ষা হয়তো তাদের নেই। তাই লোক টানতে টুম্পা-গান সঙ্গে ডিজে বক্স। মুষ্ঠিবদ্ধ স্লোগানের বদলে উন্মত্ত নাচ। তার চেয়েও আশ্চর্যের, বামফ্রন্টের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এই বদলে যাওয়া 'বাম সংস্কৃতিকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন! তাহলে পচনটা আপাদমস্তক!

কাগজে-কলমে বা ভাষণে বামফ্রন্ট নিজেদের 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলে দাবি করে এসেছে। আব্বাসউদ্দিন বাহিনীর সঙ্গে নির্বাচনী জোটে গিয়ে বামফ্রন্ট সেই ট্যাগ লাইনও হারাল। এ রাজ্যের রাজনীতির মূল সুর ধর্মনিরপেক্ষতা। এখানে ভারতের অন্য রাজ্যগুলির মতো ধর্ম বা বর্ণভিত্তিক ভোট হয় না। এটা ছিল বাঙালি হিসেবে আমাদের গর্ব। আর এ রাজ্যে বামপন্থীরাই ছিল ঐতিহ্য গড়ে তোলার অন্যতম স্থপতি। কিন্তু এরপর সেই ধর্মনিরপেক্ষ মানুষগুলো কোথায় যাবেন? এতদিন বুকে লালন করা সেই স্বপ্ন ও সংগ্রামের বুকে ছুরি বসালেন কোন অধিকারে? এক বিজেপিকে নিয়ে যখন আমরা বিপন্ন বোধ করছি, তখন একই চরিত্রের ধর্মীয় মৌলবাদী একটা শক্তিকে পশ্চিমবঙ্গে জায়গা করে দিতে আপনাদের বাধলো না? এতদিন কার্ল মার্কস বা কমিউনিজমের নামাবলি গায়ে দিয়ে বামফ্রন্ট বামপন্থার যে অপরিসীম, ক্ষমাহীন ক্ষতি করেছে, এই পদক্ষেপ তাদের কফিনে শেষ পেরেকটা পুঁতে দিল। দলের নামের সাথে মার্কসিস্ট বা কমিউনিস্ট জুড়ে দিলেই যেমন দলটা বামপন্থী হয়ে যায় না, তেমনি সেকুলার শব্দটা নামের সঙ্গে জুড়ে দিলেই দলটা ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায় না।

মনে পড়ে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'তাহাদের কথা' ছবিতে শোনা সেই কথাটা— 'লড়াই কখনো থাইমা থাকে না, অনন্তকাল ধইরাই চলে। সেই বিশ্বাস আমার আছে।'

অর্ক মালিক
বেলমুড়ি, হুগলি

ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের পথে আর এক ধাপ

বেসরকারি ব্যাঙ্ককেও এখন সরকারি লেনদেনে যুক্ত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এতদিন কয়েকটি বড় ব্যাঙ্ক বাদ দিলে বেসরকারি ব্যাঙ্কের উপর বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা তুলে নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর ফলে সমস্ত বেসরকারি ব্যাঙ্ককর সহ বিভিন্ন রাজস্ব সংগ্রহ, পেনশন দেওয়া, স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে পরিষেবা দেওয়ার মতো সরকারি কাজ করতে পারবে। বিষয়টি রিজার্ভ ব্যাঙ্ককেও জানানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য হল, এই সিদ্ধান্তের ফলে সমস্ত ব্যাঙ্ক সমানভাবে দেশের অর্থনীতির বিকাশের কাজে লাগতে পারবে। তাঁর মতে, এর ফলে বেসরকারি ব্যাঙ্কের হাতে থাকা উন্নত প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগবে। প্রতিযোগিতা বাড়বে এবং তার সাথে সঙ্গতি রেখে গ্রাহক পরিষেবা উন্নত হবে।

এই সব এত গালভরা কথার মধ্যে মূল যে বিপদটি লুকিয়ে রয়েছে তা হল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অস্তিত্বকে ধীরে ধীরে গুরুত্বহীন করে কোণঠাসা করে দেওয়া। এতদিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বেসরকারিকরণ করার নানা অজুহাত তারা খুঁজে বেড়াত। এবারের বাজেটে সরকার দু'টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে বেসরকারিকরণ করবে বলে খোলাখুলি ঘোষণা করেছে। এরপর তাদের সব ধরনের কাজকর্ম বেসরকারি ব্যাঙ্কের হাতে তুলে দেওয়ার রাস্তাও খুলে দেওয়া হচ্ছে। ব্যাঙ্ককর্মীরা জানেন, সমস্ত ক্ষেত্রে না হলেও কিছু সরকারি লেনদেনে ব্যাঙ্কের মুনাফা হয়। কিছু ক্ষেত্রে তা হয় না, বা হলেও তা খুবই সামান্য। যেগুলিতে মুনাফা নেই, আছে কেবল পরিষেবা, বেসরকারি ব্যাঙ্ক সেগুলিতে আগ্রহী হবে না। তাদের লক্ষ্য, লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। এভাবে মোদি সরকার কৌশলে লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বেসরকারিকরণের পথে এক ধাপ এগোল।

গৌরীশঙ্কর দাস
খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

অন্যান্য রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে
এস ইউ সি আই (সি)-র প্রার্থী তালিকা

আসাম

প্রার্থী	কেন্দ্র
১) চিত্রলেখা দাস	গোয়ালপারা ইস্ট
২) মহিবুল ইসলাম	গোয়ালপারা ওয়েস্ট
৩) ওসমান গনি মোল্লা	জলেশ্বর
৪) হাবিবুর রহমান	ধুবরি
৫) আব্দুর সাবুর	সাউথ সালমারা
৬) সাইদুর আলম	মানকাচর
৭) হালিমা খাতুন	সারুক্ষেত্রি
৮) কেনিডি পেগু (কুশল)	নলবারি
৯) প্রমোদ ভগবতী	ধর্মপুর
১০) শিশির কাকতি	কামালপুর
১১) পাহি বরুয়া	সিপাঝার
১২) জিতেন্দ্র চালিহা	কালাইগাঁও
১৩) স্বর্ণলতা চালিহা	পানেরি
১৪) নয়নজ্যোতি চৌধুরী	তেজপুর
১৫) সোনারাম বোরা	বহরমপুর
১৬) ব্রিঞ্চি পেগু	লখিমপুর
১৭) অনুপম চুটিয়া	নাওবাইসা
১৮) জোতিকা দোলে	ঢাকুয়াখানা
১৯) ভাইতি রিচং	মাজুলি
২০) হেমকান্ত মিরি	ধেমাজি
২১) মহেন্দ্র ধাদুমিয়া	নাহারকাটিয়া
২২) দুলালী গাঙ্গুলী	শিলচর
২৩) গৌরচন্দ্র দাস	ধলাই (এস সি)
২৪) অঞ্জন চন্দ	সোনাই
২৫) সুজিত কুমার পাল	করিমগঞ্জ নর্থ
২৬) সঞ্চিতা শুক্লা	রাতাবারি (এস সি)
২৭) বুলু চন্দ	পাথরকান্দি
২৮) সুশীল পাল	হাইলাকান্দি

কেরালা

প্রার্থী	কেন্দ্র
১) এ সাবুরা	তিরুবনন্তপুরম
২) এ সাইজু	ভাট্টিয়ুর্কাভু
৩) এস সুধীলাল	ইরাভিপুরম
৪) এস ভার্গবনকারুনাগাপ্পাল্লি	
৫) ই কুঞ্জুমন	কোট্টারাক্কারা
৬) আর রাহুল	কুন্দারা
৭) কে মহেশ	পুনালুর
৮) শরন্যা রাজ	আদুর
৯) কে শশীকুমার	মাভেলিক্কারা
১০) মাইনা গোপীনাথ	কায়ামকুলাম
১১) কে পি সুবাইদা	আম্বালাপুঝা
১২) টি মধু	হরিপ্পাদ
১৩) টি কে গোপীনাথন	চেঙ্গান্নুর
১৪) বিজু জেভিয়ার	কুট্টানাড়
১৫) কে এ বিনোদ	আলাপ্পুঝা
১৬) কে প্রথাপান	আরুর
১৭) মায়ামল কে পি	কাঞ্জিরাপ্পাল্লি
১৮) এম ভি চেরিয়ান	পুথুপ্পাল্লি
১৯) রাজিথা জয়রাম	চাঙ্গানাসেরি
২০) এম কে সাহসাদ	কোট্টায়াম
২১) এ জি অজয়কুমার	এট্টুমানুর
২২) এম জে সানি	কাড়ুথুরুথি
২৩) (পরে জানানো হবে)	ভাইকোম
২৪) কে সি জ্যোথিলেক্সমি	আঙ্গামালি
২৫) এ জি অজয়ন	আলুভা
২৬) সি বি অশোকন	থ্রিপ্পুনিথুরা
২৭) সি এন মুকুন্দন	পিরাভম
২৮) সি কে থাম্পি	মুভাত্তুপুঝা
২৯) টি আর শ্রীধরন	থোড়ুপুঝা
৩০) এম কুমার	গুরুভায়ুর
৩১) ও এম সৃজা	কোডুনগাল্লুর
৩২) পি কে ধর্মাজন	চালাক্কুডি
৩৩) টি কে বোস	মালাপ্পুরাম
৩৪) কে প্রসাদ	মালামপুঝা
৩৫) কে রহিম	কোঝিকোড-১
৩৬) সি প্রাভীন	কোইলান্ডি
৩৭) রেশমি রাভি	আঝিক্কোড

তামিলনাড়ু

প্রার্থী	কেন্দ্র
১) এস শিবকুমার	আর কে নগর
২) জে সেবাস্টিন	পেরাম্বুর
৩) পি মোহন	ভীরাপান্ডি (সালেম)
৪) এম জে ভলটেয়ার	মাদুরাই নর্থ
৫) এ মুরুগেসা	পেরিয়াকুলাম (থেনি)

পুদুচেরি

প্রার্থী	কেন্দ্র
১) এস লেনিনদোরাই	কামারাজনগর
২) কে সারাভানান	মুথিয়ালপেট
৩) এম শঙ্কর	ওর্লিয়ানপেট

রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড গোপাল বসুর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিশিষ্ট নেতা কমরেড গোপাল বসু ১৭ ফেব্রুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। প্রাচীন শহর জয়নগর বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের কর্মভূমি। সমাজ সংস্কার, শিল্প-সাহিত্য চর্চা, শিক্ষার প্রসার, স্বাধীনতা আন্দোলনে আপসহীন বিপ্লবী ধারার প্রতিভূদের নামে গৌরবান্বিত এই শহর। শিবনাথ শাস্ত্রী, উমেশ চন্দ্র দত্ত, বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যের স্মৃতিধন্য এ শহরে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট দল এস ইউ সি আই (সি)-র পলিটবুরো সদস্য কমরেড শচীন ব্যানার্জীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শান্তি সংঘ'। কমরেড গোপাল বসু তাঁর দ্বারা আকৃষ্ট ও উজ্জীবিত হয়ে ফুটবল, ভলিবল ইত্যাদি খেলার মাধ্যমে শান্তি সংঘে জড়িত হন। ক্লাবের হাতে-লেখা প্রাচীর পত্রিকা ছিল 'শান্তি'। দলেরই পলিটবুরো সদস্য প্রখ্যাত জননেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীও তাতে লিখতেন। সেই পত্রিকা ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। কালক্রমে কমরেড গোপাল বসু তাতে যুক্ত হন। ক্লাবের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল 'পরিতোষ পাবলিক লাইব্রেরি'। রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-সাহিত্য-শিল্পকলা সম্পর্কিত অসংখ্য বইয়ের ভাণ্ডার ছিল। ছিল অসংখ্য গ্রাহক ও পাঠক। শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ জনসংযোগের মাধ্যমে উচ্চ রুচি-সংস্কৃতি বোধসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টির তাগিদে নতুন নতুন মানুষকে এই কর্মকাণ্ডে সামিল করতে ও পরবর্তীকালে তাদের অনেককেই দলের কর্মীতে পরিণত করতে সক্ষম হতেন। এই প্রক্রিয়ারই ফসল কমরেড গোপাল বসু। তিনি যোগ্য সাহচর্য পেয়েছিলেন কমরেড সুধীর ব্যানার্জী, প্রফুল্ল সরকারদের কাছে। দলের প্রয়াত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ইয়াকুব পৈলান, তাঁরই বন্ধু স্থানীয় দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ও তৎকালীন জেলা নেতা তাঁরই ভাই কমরেড মধু বসুর সংস্পর্শে ও নেতৃত্বে তিনি নিজেকে দলের কর্মী থেকে নেতায় উন্নীত করেন। এই শহরে দলের কর্মীদের বসে আলোচনা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভের ক্ষেত্রটি ছিল কঠিন। 'বসুধাম' নামে খ্যাত বাড়িটি ছিল তাঁদের আশ্রয়স্থল। এখানে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ, শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড নীহার মুখার্জী, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ সহ তদানীন্তন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ নানা সভা-ক্লাস পরিচালনা করতে আসায় তা দলের কাছে ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করে। এক্ষেত্রে ঐ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কমরেড গোপাল বসুর প্রচেষ্টা ভুলে যাবার নয়।

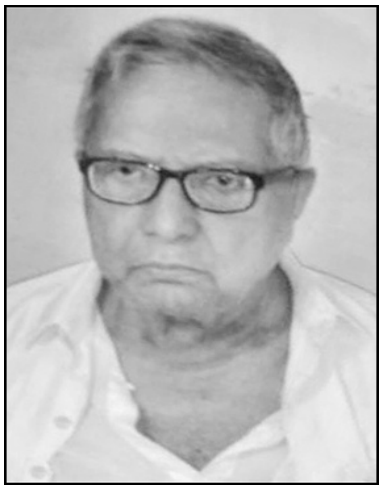

তিনি প্রভিডেন্ট ফান্ড দফতরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হলেও আমলাসুলভ মনোবৃত্তি ও অবৈধ অর্থ উপার্জনের মতো নিকৃষ্ট কাজ করেননি। তাঁর ভূমিকা ছিল অনুকরণীয় সততার ও এ কাজে তাঁর সংস্পর্শে আসা মানুষদের সহৃদয় সাহায্যকারী। উচ্চ পদাধিকারীদের অন্যায়-অসঙ্গত আচরণের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করলেও তাঁদের ও মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে সকল সহকর্মীর কাছে ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। বর্তমান দলের সাধারণ সম্পাদক দলের কাজে অধিক সময় দেওয়ার জন্য যখন তাঁকে চাকরি ছাড়তে বলেন, একবার শুনেই তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। চাকরি ছাড়বেন শুনে, অফিসের সহকর্মীরা দুঃখ পান, তাঁকে নিরস্ত করার জন্য দলের কাছেও লিখিত আবেদন পাঠান। সারা জীবনই তিনি ছিলেন অকপট। যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ভাষায় উচ্চ কণ্ঠে বলতেন। কিন্তু কোনও বিদ্বেষ থেকে তা বলতেন না বলে তিনি ছিলেন সকলের কাছে বন্ধু ও আপনজন। চাকরির সুবাদে তিনি অনুভব করেছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন নেতার পদে থাকলেও ফটিক ঘোষের কর্মকাণ্ড দলের সংস্কৃতির পরিপন্থী। এ কথা দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে বলেওছিলেন তিনি।

স্মরণসভায় শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার

চাকরি করলেও বাস্তবে দলের হোলটাইমারের মতো কাজ করতেন। চাকরি স্থলে যাওয়ার জন্য সকাল ৮টা নাগাদ ট্রেন ধরতেন। তার আগে ভোরে উঠে বিভিন্ন এলাকায় কর্মী, বিভিন্ন ক্লাব-লাইব্রেরির সাথে যুক্ত ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ করতেন। ট্রেনের মধ্যে দলের অন্যান্য সহকর্মীসহ নিত্যযাত্রীদের মধ্যে উদ্দেশ্যপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা, গল্পগুজব, গ্রুপ রিডিং করতেন। সহমর্মিতার বাঁধন গড়ে তুলতেন। এর ফলে অনেকেই দলের দরদিতে পরিণত হয়েছেন। এমনকি অফিসের মধ্যেও গণদাবী সহ নানান পত্র-পত্রিকা বিক্রি, তহবিল সংগ্রহ, কর্মসূচির প্রচার চালাতেন। অফিস শেষে প্রায় প্রতিদিন দলের কেন্দ্রীয় অফিস ৪৮ লেনিন সরণিতে যেতেন। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ সেখানে সাধারণ কর্মীদের মাঝে বসে অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক শিক্ষণীয় আলোচনা করতেন। দুর্নিবার টানে সেখানে যেতেন। সেখানে প্রায়ই সাপ্তাহিক পাঠচক্রে যোগ দিতেন। ট্রেনে ফেরার পথে অনুরূপ ভূমিকা থাকত। বিভিন্ন স্টেশনে নেমে কর্মীদের সঙ্গ দিয়ে গভীর রাতে ফিরতেন। ট্রেনের সঙ্গীদের মধ্যে তাঁর অগ্রজ সুধীর ব্যানার্জী, প্রফুল্ল সরকার প্রমুখ থাকতেন। তাঁর স্ত্রী কমরেড প্রীতি কর। হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্তা শিক্ষিকা, অনাড়ম্বর সরলমনা এই কমরেড বৃদ্ধ বয়সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অর্থ ও স্বাক্ষর সংগ্রহ করা, গণদাবীসহ পত্রপত্রিকা বিক্রি করা, বাড়ি বাড়ি ঘুরে দলের কাজ চালানোর মাধ্যমে নেতৃত্বের প্রত্যাশাকে যোগ্য মর্যাদা দেওয়ার আজীবন চেষ্টা চালিয়েছেন ও চালাচ্ছেন। কমরেড গোপাল বসুর সাহচর্যে যৌথ পরিবারে দায়িত্বশীল পরিচালক হিসাবে প্রীতি কর ভূমিকা নিয়ে থাকেন।

স্মরণসভায় সমাবেশের একাংশ

কমরেড গোপাল বসুকে প্রথম সাক্ষাতে অনেকেই মনে করতেন কঠিন রাশভারী মানুষ। কিন্তু মেলামেশার মাধ্যমে সকলেই অনুভব করতেন তাঁর সারল্য, দিলখোলা, কোমল হৃদয়। মামলার বিষয়ে হোক, চিকিৎসার ক্ষেত্রে হোক, পারিবারিক সমস্যায় হোক— যে কোনও বিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মানুষকে সাহায্য করা তাঁর স্বভাবেই পরিণত হয়েছিল।

কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের সকল জনবিরোধী নীতি ও ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিটি আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা থাকত আবেগময় তৎপরতার। শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে শোষিত শ্রেণির স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করতেন। অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ যেমন মদ-জুয়া-সাট্টা, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা ঝরে পড়ত। জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার কাউন্সিলর হিসাবে এলাকার পরিবেশের স্বার্থে ও দুর্নীতি-পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকতেন। সাহস ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জয়নগর ইনস্টিটিউশনে একদা এক প্রধান শিক্ষকের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বহুদিন ধরে শিক্ষক-ছাত্রদের আন্দোলনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। চাল ব্যবসাকে কেন্দ্র করে 'কর্ডনিং'-এর নামে গরীব মানুষের উপর পুলিশি হয়রানি ও নিগ্রহের বিরুদ্ধে আন্দোলনে, স্টেশন মোড়ে মদ ব্যবসার বিরুদ্ধে, সমাজবিরোধী দমন— ইত্যাদি ঘটনাগুলিতে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। যখন সিপিএম বহু বছর ধরে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এস ইউ সি-র সংগঠন ভাঙতে ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়েছে, অসংখ্যজনকে হত্যা করেছে, মামলার পর মামলায় নেতা-কর্মীদের জীবন জেরবার করে তুলেছে, সে সময়কার আতঙ্কের পরিবেশে তিনি অকুতোভয়ে গ্রামের পর গ্রামে ছুটে গিয়েছেন মেরুদণ্ড খাড়া রেখে।

খেলোয়াড় জীবনে তাঁরই এক সঙ্গী মুসলিম পরিবারের সন্তানকে নিজেদের বাড়িতে রাখা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। সে সময়ে তাঁদের বর্ধিষ্ণু হিন্দু পরিবারে এ কাজ ছিল কঠিন। বাবরি মসজিদ ভাঙার পর এ জেলায় বিজেপির ষড়যন্ত্রীরা মাসের পর মাস ধরে মন্দির-মসজিদকে কেন্দ্র করে প্ররোচনার দ্বারা দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল। দলের যে সব নেতা-কর্মী জনগণকে সাথে নিয়ে জান কবুল করে সে আগুন নিয়ন্ত্রণে সফল চেষ্টা চালিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রয়াত নেতা ছিলেন অন্যতম।

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আন্দোলনে গোটা জেলায় তিনি ঘুরেছেন। এমনকী কাকদ্বীপ - সাগর - নামখানার দুর্গম দ্বীপগুলিতে সাংগঠনিক কাজে, জনসংযোগের জন্য গরিব মানুষদের পর্ণকুটিরে মাইলের পর মাইল হেঁটে ছুটে বেড়িয়েছেন।

দলের চাঁদা নিয়মিত দেওয়া, তহবিল সংগ্রহে নিজস্ব উদ্যোগ, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পত্র-পত্রিকা পাঠ ও অন্যদের তাতে উৎসাহিত করা নিষ্ঠার সাথে চালিয়ে গিয়েছেন। অকপট কথা বলার কারণে কেউ দুঃখ পেয়েছেন বুঝলে তাদের কাছে ক্ষমা চাইতেও দ্বিধা করতেন না। এসবের মাধ্যমে তিনি দলের কর্মী- সমর্থক-জনগণের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন।

তাঁর মরদেহ ১৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার হার্ট ক্লিনিক থেকে রাজ্য অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে ও উপস্থিত কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও জেলা নেতারা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। এরপর মরদেহ জয়নগরে জেলা অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও নেতা-কর্মীরা শ্রদ্ধা জানান। ২৭ ফেব্রুয়ারি জয়নগরে প্রকাশ্য স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য তাঁর চরিত্রের গুণাবলি তুলে ধরেন।

কমরেড গোপাল বসু লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিন স্মরণে

৫ মার্চ বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিনের ৬৮তম স্মরণ দিবসে কলকাতায় এসইউসিআই (সি)-র কেন্দ্রীয় অফিসে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

জ্বালানির দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ

পেট্রল ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের দাম আকাশ ছুঁয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধিতেও জনজীবন জেরবার। এর প্রতিবাদে দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারীতে ৩ মার্চ এসইউসিআই (সি)-র বিক্ষোভ

মধ্যপ্রদেশে নাগরিক ও কিসান মহাপঞ্চায়েত

কৃষকবিরোধী তিনটি কৃষি আইন, বিদ্যুৎ বিল ২০২০ বাতিল এবং পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশের গুনা জেলার আরেনে ৪ মার্চ এআইকেকেএমএসের ডাকে অনুষ্ঠিত হল কিসান-নাগরিক মহাপঞ্চায়েত। শত শত কৃষকের পাশাপাশি শিক্ষক, ডাক্তার, লেখক, ছাত্র-যুব সহ সমাজের বহু স্তরের মানুষ এই পঞ্চায়েতে যোগ দেন। এআইকেকেএমএসের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। মধ্যপ্রদেশ জুড়ে কৃষক আন্দোলন তীব্রতর করার সিদ্ধান্ত নেয় মহাপঞ্চায়েত।

কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে হরিয়ানায় এআইকেকেএমএস

৫ মার্চ দিল্লিতে অবস্থানরত কৃষকদের আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে হরিয়ানার ভিওয়ানিতে এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখান এলাকার মানুষ

অযোধ্যা পাহাড়ে আগুন

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি রাজ্য সম্পাদকের

এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৭ মার্চ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিচের চিঠিটি পাঠান।

গত কয়েকদিন ধরে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় দাউ দাউ করে জ্বলছে। এই আগুন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। যা কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া ব্রাজিলের আমাজন জঙ্গলের 'ম্যানমেড' অগ্নিকাণ্ডের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।

সারা বিশ্বজুড়ে জল, জঙ্গল, জমির থেকে সাধারণ মানুষকে উৎখাত করে কর্পোরেট পুঁজির দানবেরা আরও মুনাফার লোভে তাদের হিংস্র থাবা বসাচ্ছে। পাহাড়ে অগ্নিসংযোগের এই ঘটনার পিছনেও আমরা মাফিয়া, চোরাকারবারি ও কর্পোরেট দানবদের চক্রান্তের আশঙ্কা করছি।

এমনিতেই দীর্ঘদিন ধরে পাহাড়ের অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ, মাফিয়া, চোরাকারবারি ও কর্পোরেটরা লুঠ করছে, পাহাড়ের ওপরের গ্রামগুলি থেকে জঙ্গলের রক্ষক বনবাসী আদিবাসী মানুষদের উৎখাতের চক্রান্ত চালাচ্ছে। সরকার কার্যত নীরব থেকে প্রাকৃতিক সম্পদের এই লাগাতার লুঠ ও ধ্বংসকে সংগঠিত হতে দিচ্ছে। আমরা রাজ্য সরকারকে এ'রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নির্বাচনী ব্যস্ততার অজুহাতে কেবলমাত্র জেলা প্রশাসনের হাতে ছেড়ে না দিয়ে তৎপরতার সাথে কার্যকরী ভূমিকা নিতে আবেদন জানাচ্ছি। একই সঙ্গে দাবি করছি—

১) প্রাকৃতিক সম্পদ ও বনবাসী মানুষদের অস্তিত্ব বিপন্নকারী অযোধ্যা পাহাড়ের এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডনিয়ন্ত্রণ করতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সরকারকে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

২) অসংখ্য মূল্যবান বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ অযোধ্যা পাহাড় সহ রাজ্যের অন্যান্য পাহাড়ের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডগুলির তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

পরিচারিকাদের বিক্ষোভ পশ্চিম মেদিনীপুরে

২৪ ফেব্রুয়ারি সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলাশাসক এবং জেলা ভূমি ও ভূমি-সংস্কার দপ্তরের আধিকারিককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এ জেলায় পরিচারিকাদের অনেকেরই রেশন কার্ড নেই। রেশনে বরাদ্দ অনুযায়ী খাদ্যসামগ্রীও অনেকে পাচ্ছেন না। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমস্যা, যারা এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত তাদের এই প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা না পাওয়ার মতো কিছু সমস্যা রয়েছে। এ ছাড়া পরিচারিকাদের যাঁরা মাথাগোঁজার অন্য কোনও উপায় না পেয়ে দীর্ঘ বছর ধরে মেদিনীপুর বা খড়গপুর শহরের উপকণ্ঠে খাস জায়গার উপর নিজেদের বাসস্থান বানিয়ে দিন গুজরান করছেন, তাদের আইনি অধিকার দেওয়া এবং উক্ত সমস্যাগুলির সমাধানের দাবিতে ছিল এই ডেপুটেশন। নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদিকা জয়শ্রী চক্রবর্তী, সহ-সম্পাদিকা ভবানী চক্রবর্তী, সমিতির সদস্যা বুলু সেনাপতি সিংহ, বিউটি বেগম, রুনু পাতর।

দুই শতাধিক পরিচারিকার এক সুশৃঙ্খল মিছিল মেদিনীপুর রেলস্টেশন থেকে কেরানিতলা হয়ে জেলাশাসক দপ্তরে পৌঁছায়। জেলাশাসক দপ্তরের সামনে বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র জেলা সম্পাদক পূর্ণ চন্দ্র বেরা, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা ঝর্ণা জানা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন জয়শ্রী চক্রবর্তী, ভবানী চক্রবর্তী, কবিতা জানা, ঊষা রানা প্রমুখ।

দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার মেখলিগঞ্জে

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com